সাম্প্রতিক ঘটনাবলী (মে-জুলাই ২০১৭)

ধর্ষণ, যৌননিপীড়ন ও পুলিশের ভূমিকা

বিচার না পেয়ে বাবা-মেয়ের আত্মহত্যা!

শ্রীপুরে নির্যাতনের বিচার না পেয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে শিশুকন্যাসহ এক বাবা আত্মহত্যা করেছেন। গত ২৯ এপ্রিল শনিবার সকাল ৯ টার দিকে শ্রীপুর রেল স্টেশনের দক্ষিণে আউটার সিগন্যালের পাশে দেওয়ানগঞ্জগামী তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিলে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান। নিহতরা হলেন: উপজেলার গোসিংগা ইউনিয়নের কর্নপুর (সিটপাড়া) গ্রামের হযরত আলী (৪৫) ও তার পালিত কন্যা আয়েশা আক্তার (১০)। নিহত হযরত আলীর স্ত্রী হালিমা বেগম জানান, ২ মাস আগে একই এলাকার ফজলুল হকের পুত্র ফারুক শিশু আয়েশাকে তার বাড়ির পাশ থেকে সাইকেলে করে গভীর বনে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় ফারুক ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তাকে মারপিট করে আহত করে। এ ঘটনায় হালিমা বাদী হয়ে তাৎক্ষণিক শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও শ্রীপুর থানার এএসআই বাবুল মিয়া ঘটনাটি মোটা টাকার বিনিময়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় মেম্বার আবুল হোসেনের যোগসাজসে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়া হলে হালিমা শ্রীপুর থানায় ১৫/২০ বার গিয়েও মামলা করতে ব্যর্থ হন। এ ঘটনায় কোন বিচার না পাওয়ায় হালিমার স্বামী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তাছাড়া গত শুক্রবার বিকেলে ছাগল বাঙ্গী ক্ষেত খাওয়ার ঘটনার জের ধরে ফারুকসহ আরো কয়েকজন তার মেয়ে আয়েশাকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে যায় এবং পূর্বের ঘটনা মিমাংসা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে আয়েশা কৌশলে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে রক্ষা পায়। এ ঘটনায় ঐ দিন বিকেলেই হালিমা আবার থানায় অভিযোগ করতে গেলে থানার ডিউটি অফিসার ও ওয়্যারলেস অপারেটর অভিযোগ না নিয়ে তাকে অপমান করে থানা থেকে বের করে দেয়। একদিকে মেয়ে নির্যাতনের বিচার না পাওয়া এবং আরেকদিকে মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা ও মিমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করায় রাগে, ক্ষোভে, লজ্জা ও ঘৃণায় মেয়েকে নিয়ে হালিমার স্বামী একত্রে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ধর্ষিতাকে থানা থেকে বের করে দিয়েছিলেন ওসি ফরমান

বখাটেদের কাছ থেকে নিজের সুরক্ষার জন্য গত ৩ মার্চ বনানী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি নম্বর-১৯২) করেছিলেন গার্মেন্টস কর্মী। তবে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় একদিন পর ৪ মার্চ রাত সাড়ে ৯ টার দিকে গার্মেন্ট থেকে বাসায় ফেরার পথে তাকে অপহরণ করে কড়াইল বস্তির জুনায়েদ, নায়েব আলী, সোহাগ ও নাতি বালী নামের চার বখাটে। ধর্ষণের পর গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসা নেন। সেখানে টানা আট দিন চিকিৎসা শেষে কিছুটা সুস্থ হয়ে সরাসরি ধর্ষণের সার্টিফিকেট নিয়ে থানায় চলে যান তিনি। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বি এম ফরমান আলী ১২ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ভুক্তভোগীকে নানা অজুহাতে ঘুরাতে থাকেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, "ওসি সাহেব আমার সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ করেছেন। আমাকে একের পর এক মানহানিকর প্রশ্ন করতেন। একদিন আমাদের গলাধাক্কা দিয়ে থানা থেকে বের করার জন্য নির্দেশ দেন অন্য পুলিশ সদস্যদের। বাধ্য হয়ে ঢাকার আদালতে গিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করি"।

সৎ মেয়েকে আট বছর ধরে ধর্ষণের অভিযোগ

আট বছর ধরে এক মেয়েকে ধর্ষণ করে আসছিলেন তাঁর সৎ বাবা আরমান হোসেন ওরফে সুমন (৩৮)। একপর্যায়ে মেয়েটির আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়ে তাঁর এক বন্ধুকেও হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। এমন অভিযোগ করে সৎ বাবার বিরুদ্ধে গতকাল মঙ্গলবার রাতে রমনা মডেল থানায় মামলা করেছেন বর্তমানে ২০ বছর বয়সী ওই মেয়ে। আরমান হোসেন বেসরকারি টিভি চ্যানেল নিউজ ২৪-এর শব্দ প্রকৌশলী। তাঁর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

জন্মদিনের পার্টির কথা বলে বনানীতে দুই ছাত্রী ধর্ষণ

গত ২৮ মার্চ ঢাকার রেইনট্রি হোটেলে জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রণ করে দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীকে ধর্ষণ করে সাফাত ও সাদমান। ঘটনার ৪০ দিন পর ভুক্তভোগীদের একজন বনানী থানায় আসামিদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে। সাফাত ও সাদমান ছাড়াও ওই মামলার অন্য আসামিরা হলেন- নাঈম আশরাফ (৩০), সাফাতের গাড়িচালক বিলাল (২৬) ও দেহরক্ষী রহমত আলী। গত ৬ মে বনানী থানায় তারা মামলা দায়ের করে। এ ঘটনায় জড়িত পাঁচ আসামির একজন আপন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সাফাত আহমেদ (২৬)। আরেক আসামি সাদমান সাকিফ (২৪) পিকাসো রেস্টুরেন্টের মালিকের ছেলে। ভুক্তভোগী দুই তরুণীর একজন জানান, "জড়িতদের মধ্যে তিনজনই প্রভাবশালী পরিবারের। সাফাতের বাবা দিলদার আহমেদ আপন জুয়েলার্সের মালিক। তারা ঘটনার পর থেকেই আমাদের নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল। আসামীদের একজন তাদের দেহরক্ষীকে আমার বাসায় পাঠিয়ে হুমকিও দিয়েছিল। তাদের ভয়েই আমরা মামলা করতে দেরি করেছি। মামলা হওয়ার পরও তারা হুমকি দিয়েই চলেছে। প্রতিনিয়ত তারা তাদের লোক দিয়ে আমাদের অনুসরণ করাচ্ছে"।

শিশু ধর্ষণ বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে ওসিসি

বেড়েই চলেছে শিশু ধর্ষণের ঘটনা। প্রতিদিনই কোনও না কোনও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়ে ভর্তি হচ্ছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি)। ওসিসি'র তথ্যানুযায়ী, এসব শিশুর বয়স ছয় বছর থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। গত কয়েক দিনে এই সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ায় তাদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে ওসিসি। ওসিসি ও ভিকটিমদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শিশুরা কেবল ঘরের বাইরেই নয়, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে নিজ ঘরে, নিকটাত্মীয়-স্বজনদের হাত থেকেও রক্ষা পাচ্ছে না তারা। মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তথ্যানুযায়ী, গত জানুয়ারিতে ১৩ জন, ফেব্রুয়ারিতে ১৫ জন, মার্চ ও এপ্রিলে ২২ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় বরিশালে এক শিশু মারাও গেছে।

ধর্ষণ মামলায় হাজারে সাজা মাত্র ৪ জনের

ঘৃণ্য অপরাধ ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতদের সাজা হচ্ছে না। পুলিশ সদর দপ্তর এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলাগুলোর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় চার ভাগেরও কম মামলার। আর সাজা পায় হাজারে মাত্র চার আসামি। আইনের ত্রুটি, ফরেনসিক টেস্টের সীমাবদ্ধতা, প্রভাবশালীদের চাপ এবং সামাজিক কারণে এ রকম হচ্ছে বলে মনে করে ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারকে আইনি সহায়তা দেওয়া মানবাধিকার সংগঠনগুলো। নারীপক্ষের এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলায় ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে করা তিন হাজার ৬৭১টি মামলায় মাত্র চারজনের সাজা হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত নারীপক্ষ ঢাকা, জামালপুর, ঝিনাইদহ, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট ও নোয়াখালীতে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ পায় গত মার্চে। ছয় জেলার ৭ টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে করা মামলার ভিত্তিতে এ গবেষণা চালায় নারীপক্ষ।

মহিলা আইনজীবী সমিতির এক জরিপে দেখা যায়, নানা কারণে ধর্ষণ মামলার ৯০ শতাংশ আসামি খালাস পেয়ে যায়। পুলিশি তদন্তে ত্রুটি এবং অবহেলা ছাড়াও এর পেছনে কাজ করছে নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারের দীর্ঘসূত্রীতা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে চিকিৎসা

সহায়তা নিতে আসেন ২২ হাজার ৩৮৬ জন নারী। তার মধ্যে মামলা হয় পাঁচ হাজার তিনটি ঘটনায়। এর মধ্যে ৮০২টি ঘটনায় রায় দেওয়া হয়েছে। শাস্তি পেয়েছে ১০১ জন। রায় ঘোষণার হার ৩ দশমিক ৬৬ ভাগ। আর সাজার হার ০ দশমিক ৪৫ ভাগ।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশের বিভিন্ন থানায় ১৮ হাজার ৬৬৮টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২০১৬ সালে করা হয়েছে তিন হাজার ৭১৭, ২০১৫ সালে তিন হাজার ৯২৮, ২০১৪ সালে তিন হাজার ৬৮৯, ২০১৩ সালে তিন হাজার ৬৫০ এবং ২০১২ সালে তিন হাজার ৬৮৪টি মামলা হয়। এসব মামলার মধ্যে প্রতি বছর গড়ে চার ভাগ আসামির সাজা হয়।

তথ্যসূত্রঃ *৩০ এপ্রিল, ২০১৭ , ইত্তেফাক; বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ মে ২০১৭ ; প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১৭; পরিবর্তনডটকম, ৭ মে ২০১৭; প্রথম আলো, ১৩ জুলাই; বাংলাট্রিবিউন, ১৯ মে ২০১৭; সমকাল, ২৮ মে, ২০১৭*

সৌদিতে নারী গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতন বেড়েছে

বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীরা সৌদি আরবে বেতন নিয়ে বঞ্চনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করে আসছেন। রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটে যোগাযোগ করে জানা গেছে, নারী গৃহকর্মীদের সৌদি আরবে পাঠানোর দুই বছর পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। রিয়াদে বাংলাদেশের শ্রম কাউন্সিলর মো. সরওয়ার আলমের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সৌদি আরবে দুটি সেফ হোমে আড়াই থেকে তিনশ নারীকে রাখার ব্যবস্থা আছে। পালিয়ে এসে সেফ হোমে আশ্রয় নেওয়া এসব নারীর অভিযোগগুলো সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুরাহার পর তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। ২০১৫ সালের মে মাস থেকে এ বছরের মে পর্যন্ত সেফ হোম থেকে প্রায় দেড় হাজার নারীকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এ বছরের মে মাস পর্যন্ত সেখানে বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীদের মধ্যে ২২ জন নানা কারণে মারা গেছেন বলে জানান তিনি। বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা জানিয়েছেন, খুনের দায়ে ইন্দোনেশিয়ার দুই নারীকে সৌদি আরবে শিরচ্ছেদের প্রতিবাদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে গৃহশ্রমিক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্যাতনসহ নানা রকম অভিযোগের কারণে ফিলিপাইনও ২০১৫ সালে সৌদি আরবে গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার (জিসিসি) দেশগুলোর মধ্যে বাহরাইন ছাড়া অন্য দেশগুলোর শ্রম আইনে গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতের সুযোগ নেই। আইনি সুরক্ষা না থাকায় কম বেতন কিংবা বিনা বেতনে কাজ করা, কাজের সময়ের কোনো পরিসীমা না থাকা, ছুটি না থাকা, শারীরিক-মানসিক নির্যাতনসহ সব ধরনের নিপীড়নের ঝুঁকি থাকে নারী গৃহকর্মীদের।

সৌদি আরবে যাওয়া প্রায় ৫০ জন নারী কর্মীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গত বছর দূতাবাস ঢাকায় একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, ডজন'খানেক কারণে বাংলাদেশের নারী কর্মীরা ঝুঁকিতে পড়ছেন। এসব কারণের মধ্যে আছে ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণ-আতঙ্ক, গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বেতন না দেওয়া, ফোন কেড়ে নেওয়া, নির্যাতনের পর পালিয়ে গেলে থানায় চুরি ও নাশকতার মামলা দেওয়া, নির্যাতনের পর পালিয়ে পুলিশের আশ্রয়ে গেলে আবার আগের নিয়োগকর্তার কাছে ফেরত পাঠানো, অসুস্থ হলে চিকিৎসা না করা, বেশি অসুস্থ হলে রাস্তা কিংবা দূতাবাসের সামনে ফেলে যাওয়া এবং দূতাবাসকে না জানিয়ে ক্রীতদাসের মতো এক এজেন্সি থেকে অন্য এজেন্সিতে বিক্রি করে দেওয়া উল্লেখযোগ্য। এ অবস্থায় সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা না গেলে বাংলাদেশ থেকে গৃহকর্মী পাঠানো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার পক্ষে মত দেওয়া হয় ওই প্রতিবেদনে। ওই মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে নির্যাতনের কারণে অন্তত পাঁচজন আত্মহত্যা করেছেন। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১২ জন, যাঁদের দুজন সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। আর বাকিরা নানা রকম অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রাণ বাঁচাতে ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। এরপরও বন্ধ হয়নি সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মীদের পাঠানো। সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরবের সঙ্গে নারী গৃহকর্মী নিয়ে চুক্তি সইয়ের পর এখন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে গেছেন প্রায় দেড় লাখ নারী। এ বছরের প্রথম চার মাসে সৌদি আরবে যাওয়া নারী গৃহকর্মীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ৩১১।

তথ্যসূত্রঃ *১১ জুন ২০১৭, প্রথম আলো*

কেরানীগঞ্জে সমকামী সন্দেহে আটক ২৭

সমকামী সন্দেহে কেরানীগঞ্জের আটিবাজার ছায়ানীড় কমিউনিটি সেন্টার থেকে ২৭ জনকে আটক করেছে র‍্যাব। এ সময় কমিউনিটি সেন্টারের মালিককেও আটক করা হয়। গত ১৯ মে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে তাদের আটক করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ *বাংলা ট্রিবিউন, ১৯ মে ২০১৭*

আবারও পাহাড় ধসের বিভীষিকা

গত ১২ জুন সোমবার থেকে দুই দিনের টানা বর্ষণে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধসে মহা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ১৭ জুন ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানায়, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচ জেলায় এই দুর্যোগে ১৫৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে। পাহাড় ধসে রাঙ্গামাটিতে ১১০ জন, চট্টগ্রামে ২৩ জন, বান্দরবানে ৬ জন, কক্সবাজারের ২ জন ও খাগড়াছড়িতে ১ জনের প্রাণহানির তথ্য তাদের হাতে পৌঁছেছে। এছাড়া চট্টগ্রামে ঢলে ভেসে গিয়ে, গাছ ও দেয়ালচাপায় এবং বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৪ জনের। উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, পুলিশ, জেলা প্রশাসন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা। ১৬ জুন তারিখ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

পাহাড় ধসে রাঙ্গামাটির ক্ষতি

১২ ও ১৩ জুন রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত পাহাড় ধসে রাঙ্গামাটি জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। রাঙ্গামাটি জেলার ১০টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা, ৫০টি ইউনিয়ন কম বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে এই জেলার মোট ১৮,৫৫৮ টি পরিবারের ১২৩১২৭ জন লোক পাহাড় ধস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া রাঙ্গামাটি জেলায় এই দুর্ঘটনায় মোট ১২০ জন নিহত এবং ১৯২ জন আহত হয়। সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত বাড়ির সংখ্যা ১২৩১ টি, আংশিক রুপে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা ৯৫৩৭ টি, গবাদি পশুর ক্ষতি ৩৪ টি, হাঁসমুরগীর ক্ষতি ১৩, ফসলাদি বিনষ্ট ১৮৯৯.৩১ হেক্টর জমি, ধ্বংস প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে স্কুল/মাদ্রাসা ৭ টি, কলেজ ১ টি, আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুল/মাদ্রাসা ৪৯ টি, কলেজ ১ টি, ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক ৯.৪২ কি.মি., ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য খামার ৪৩ টি, ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ সমূহের মধ্যে অগভীর নলকূপ ২৪৮ টি, হস্তচালিত নলকূপ ২১৯ টি, পুকুর/ জলাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০ টি।

বিচ্ছিন্ন রাঙ্গামাটিতে জ্বালানি সংকট, খাবারের দাম চড়া

১৩ জুন ভোর থেকে পাহাড় ধসের কারণে এই জেলার সঙ্গে দেশের অন্য এলাকার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাঙ্গামাটি শহরে জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে এলপি গ্যাস, ও কাঁচাবাজারে নিত্যপণ্যের তীব্র সংকট দেখা দেয়। সবজিসহ খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ে অস্বাভাবিক হারে। ১২ জুন রাত থেকেই অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা শহর। বিদ্যুৎ না থাকায় ব্যাহত হয় হাসপাতালসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কাজ। ১০০ শয্যার রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে বিদ্যুতের মতো পানিও না থাকায় রোগীদের সীমাহীন দুর্ভোগে পড়তে হয়। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত এলপি গ্যাসের বোতল প্রতি দামও তিন দিনে ৮৬০ টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার ১০০ টাকা হয়েছে। জ্বালানি সংকটের কারণে যানবাহন চলাচলও সীমিত হয়ে পড়ে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্র জানায়, রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়কসহ বিভিন্ন সড়কের ১০৯ টি স্থানে ভাঙন দেখা দেয়।

পাঁচ জেলার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ঘরবাড়ি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পাঁচ জেলার লক্ষাধিক মানুষ। নিঃস্ব লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজারের জায়গা হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্রে। দুর্যোগ মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ৩০ লাখ টাকা চেয়ে পেয়েছে মাত্র ১৫ লাখ। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা প্রশাসন এখনও ত্রাণের চাহিদাই পাঠায়নি! ক্ষতিগ্রস্তদের চূড়ান্ত তালিকাও তৈরি হয়নি।

পাহাড় ধসের এক মাসেও জেলার যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক করা যায়নি। শহরটি এখন প্রায় পর্যটকশূন্য। আসবাবপত্র কল্যাণ সমিতির দেওয়া তথ্যমতে, পুরো জেলায় কাঠের আসবাবের দোকান আছে রয়েছে প্রায় ৬০০টি। শুধু রাঙামাটি শহরেই এ সংখ্যা ৩৫০টি। সমিতির উপদেষ্টা আবদুল ওয়াদুদ বললেন, প্রতিদিন রাঙামাটি থেকে ৫০ লাখ টাকার সামগ্রী বাইরে যায়। এখন তা প্রায় বন্ধ। দিন-চুক্তিতে থাকা এ খাতের শ্রমিকদের একটি অংশ এর মধ্যে চাকরি খুইয়েছেন বলে জানান তিনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধসের সময়কাল: নিহতদের শতকরা ৬৪ জন বাঙালী

দেশে এখনও পর্যন্ত ভয়াবহ পাহাড় ধসগুলো ঘটেছে ২০০০ সালের পরে। ২০০৮ সালে বান্দরবান শহরের বালুচরা এলাকায় পাহাড় ধসে ১৩০ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২০০৭ সালের ১১ জুন টানা বর্ষণে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের হাটহাজারী, পাহাড়তলি, বায়েজীদ বোস্তামি, খুলশী এলাকায় পাহাড় ধসে ১২৭ জন নিহত এবং দুই শতাধিক মানুষ আহত হন। ২০০৯ সালের ৬ মে বান্দরবানের গ্যালেঙ্গা এলাকায় প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু পাহাড় ধসে সাংগু নদীতে পড়ে যায়। এ দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানি না ঘটলেও ২৫ ফুট প্রশস্ত সাংগু নদীর অন্তত ১০ ফুটজুড়ে উঁচু বাঁধের সৃষ্টি হয় এবং নৌযান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সালের ১৮ মে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের কালিঘাটি উপজেলার চা-বাগানসংলগ্ন পাহাড় বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার তোড়ে ধসে পড়ে। ফলে একই পরিবারের ৫ জনসহ মোট ৬ জন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাহাড় ধসে গত ১০ বছরে ৬ সেনা সদস্যসহ ৩ শতাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। ২০১১-২০১৩ সালে পাহাড় ধসে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের, ২০১৫ সালে কক্সবাজার শহরের রাডারের পাহাড় ধসে মা-মেয়েসহ ৫ জন এবং সর্বশেষ ২০১৬ সালে পাহাড় ধসে মারা যায় ১৭ জন মারা যায়।

গত ছয় বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে যত মানুষ মারা গেছেন, তাঁদের ৬৪ শতাংশই বাঙালি। নিহত এসব বাঙালির মধ্যে আবার প্রায় সবাই সমতল থেকে যাওয়া পুনর্বাসিত বাঙালি। দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ, স্থপতি, ভূতাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে পাহাড়ে বাঙালিদের পুনর্বাসন শুরু হলে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় অনেক বসতি গড়ে ওঠে। পাহাড়ের ভিন্ন ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রাখা হয়নি। এখন এর ভুক্তভোগী হচ্ছেন দরিদ্র মানুষ। ২০১২ সাল থেকে এ বছরের চলতি মাস পর্যন্ত পার্বত্য তিন জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ১৬৬ জন পাহাড় ধসে নিহত হয়েছেন। তিন জেলার ত্রাণ কার্যালয় থেকে এই হিসাব পাওয়া গেছে। ছয় বছরে নিহত ১৬৬ জনের মধ্যে ১০৬ জনই বাঙালী।

পাহাড়ি ঢল, অপরিকল্পিত বসতি, বন উজাড় ও পাহাড় কাটার কারণেই ধস

এক যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক-চতুর্থাংশ বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ডের ট্রাস্টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশের একটি যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, এক যুগে তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন ধরনের বনভূমি কমেছে ৩ লাখ ৬২ হাজার ৩৬ হেক্টর। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তৈরি 'গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট: কান্ট্রি রিপোর্ট বাংলাদেশ' প্রতিবেদন অনুযায়ী পাহাড়ের দুই বৃহৎ সংরক্ষিত বন কাসালং ও রাইংখংয়ের বিশাল দুই অরণ্যে ১৯৬৩ সালে প্রাকৃতিক বন ছিল ১ লাখ ৭২ হাজার হেক্টর। ১৯৯০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৮৪ হাজার হেক্টরে। ২০০৫ সালে পরিমাণ হয় ৭০ হাজার হেক্টর। দেশের তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির বনভূমি ও পানির উৎসের পরিবর্তনের ধরন নিয়ে সিইজিআইএস এবং ওয়াটারএইডের একটি যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে এখানে ২৭ দশমিক ৫২ শতাংশ প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়েছে। আর ৬১ শতাংশ পাহাড়ি ঝরনা শুকিয়ে গেছে। এর ফলে এই অঞ্চলের পাহাড়ের মাটির বুনন নষ্ট হয়ে তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। একই সময়ে ২৮ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ কৃষিজমি বেড়েছে। গত কয়েক যুগে প্রাকৃতিক বন কেটে গজারি, সেগুন, রাবার ও ফলবাগান তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর শিকড় ছোট ও লতাগুল্ম কম। এতে মাটি আলগা ও শুকনো হয়ে গেছে। অতিবৃষ্টির ফলে মাটি দ্রুত ভেঙে পড়েছে। ফলে পাহাড় ধসের মতো বিপর্যয় ঘটেছে। পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে নির্মাণ করা হয়েছে একের পর এক সড়ক। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে গড়ে তোলা হয়েছে বসতি-অবকাঠামো। এতে ভূতাত্ত্বিক গঠন নষ্ট হয়ে পাহাড় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া পরিবেশবাদীদের পর্যবেক্ষণ বলছে, ১২ জুন মধ্যরাত থেকে তিন পার্বত্য জেলায় একের পর এক পাহাড় ধসের ঘটনায় দেখা যায়, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সড়কের দুই পাশের পাহাড়গুলোই বেশি ধসেছে। এসব পাহাড়ে বিভিন্ন স্তরে মাটি ও বালুর মিশ্রণ রয়েছে। এ বিশেষ ধরনের ভূতাত্ত্বিক গঠনকে আমলে না নিয়ে এবং ধস রোধের কোনো ব্যবস্থাপনা না রেখেই সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ভৌগোলিক বুনন ও গঠন নষ্ট করে সড়ক নির্মাণের পর পাহাড়গুলোর ওপর আরেক বিপদ তৈরি করে বসতি স্থাপনকারীরা। সড়ক নির্মাণের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠা পাহাড়গুলোতে বসতি স্থাপন বেড়ে গিয়ে বড় বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে। পাহাড় কেটে নানা পর্যটন স্থাপনা ও সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রেও পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও ঝুঁকিকে আমলে নেওয়া হয়নি। এর সঙ্গে অতিবৃষ্টি যোগ হয়ে বড় ধরনের ধস ও বিপর্যয় ঘটেছে। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ও বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণে এ কথা বলা হয়েছে।

পাহাড়ের দুই বৃহৎ সংরক্ষিত বন কাসালং ও রাইংখংয়ের বিশাল দুই অরণ্যে ১৯৬৩ সালে প্রাকৃতিক বন ছিল ১ লাখ ৭২ হাজার হেক্টর। ১৯৯০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৮৪ হাজার হেক্টরে। ২০০৫ সালে পরিমাণ হয় ৭০ হাজার হেক্টর।

প্রভাবশালীদের ছোবলে পাহাড় উজাড়

তিন পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজারে পর্যটনের নামে ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন পাহাড় লিজ ও বন্দোবস্ত নিয়ে যে যার মতো করে অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটছে। নির্মাণ করছে স্থাপনা। তিন পার্বত্য জেলায় বন উজাড়েও জড়িত রয়েছে শক্তিশালী কাঠ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় পাহাড় যেমন রয়েছে বেশি, তেমনি এই এলাকায় পাহাড় কাটাও চলছে। এই এলাকায় বর্তমান ও সাবেক অনেক মন্ত্রী, এমপি ও মেয়রের নামে রয়েছে পাহাড়। যেসব পাহাড়ের অধিকাংশই কেটে সমতল করে ফেলা হয়েছে। নির্মাণ করা হচ্ছে শিল্প-কারখানা, আবাসন প্রতিষ্ঠানসহ নানা স্থাপনা। বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার আরেফিন নগরের পাহাড় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চন্দ্রনগর পাহাড় কাটা চলছেই। উইমেন ইউনিভার্সিটির পরের একটি পাহাড় এখন ছিন্নমূল পাহাড় নামে পরিচিতি পেয়েছে। কোথাও কোথাও রীতিমতো এস্কেভেটর লাগিয়ে প্রভাবশালীরা পাহাড় কাটে। সীতাকুণ্ডের সলিমপুরে অধিকাংশ পাহাড় কেটে প্লট আকারে বিক্রি করেছে পাহাড়খেকোরা। নগরীর লালখান বাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নামেই রয়েছে পাহাড়। তার পাহাড়েও রয়েছে অবৈধ স্থাপনা। মানিক পাহাড় কেটে বস্তি বানানো হয়েছে। নিম্ন আয়ের লোকজনের কাছে ভাড়া দিয়ে আদায় করা হয় টাকা।

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজারেও জেলা শহর ও এর আশপাশের পাহাড় যে যেভাবে পারছে দখল করে নির্মাণ করছে অবৈধ, অননুমোদিত ও অপরিকল্পিত স্থাপনা। আবার জেলা শহরের বাইরে বিভিন্ন দুর্গম উপজেলায়

পাহাড় বন্দোবস্তি নিয়ে রাবার বাগান, চা বাগান, হর্টিকালচার বা উদ্যান উন্নয়নের নামে পাহাড় লিজ নিয়ে প্রভাবশালীরা তা কাটছে। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজারে পর্যটনের নামে নির্মাণ করা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা। পর্যটন নগরী কক্সবাজারে গত পাঁচ বছরে পাহাড় কেটেই গড়ে তোলা হয়েছে অন্তত ৩০ হাজার স্থাপনা।

তথ্যসূত্রঃ *বিডিনিউজ২৪, ১৭ জুন ২০১৭; প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০১৭; পাহাড়২৪ ডট কম, ৮ জুলাই ২০১৭; প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০১৭; সমকাল, ১৭ জুন, ২০১৭; প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০১৭; প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০১৭; প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০১৭; বাংলাট্রিবিউন, ১৪ জুন ২০১৭; যুগান্তর, ১৭ জুন ২০১৭*

বিশ্বে মোটা চালের দাম বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি

বিশ্বের মধ্যে মোটা চালের দাম এখন বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। বেড়েছে সব ধরনের মাঝারি ও সরু চালের দামও। চার-পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য কেবল চাল কেনার পেছনেই মাসে খরচ বেড়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। রাজধানীর খুচরা বাজারে এখন মোটা চাল মানভেদে ৪৫ থেকে ৪৮ টাকা, মাঝারি মানের চাল ৫০-৫৪ টাকা ও সরু চাল ৫৬-৫৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে খোঁজ নিয়ে নিয়ে জানা গেছে, নতুন মৌসুমের চালের সরবরাহ বাড়লেও সেখানে দাম কমেনি। চালের দাম পর্যবেক্ষণকারী সরকারি তিনটি সংস্থার তথ্য বিশেষণ করে দেখা গেছে, এক বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে চালের দাম বেড়েছে।

চালের আন্তর্জাতিক দর

মোটা চালের দাম বিশ্বে এখন বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। এরপরই আছে পাকিস্তান, তাও বাংলাদেশের চেয়ে ১০ টাকা কম। সরকারি হিসাবেই দেশে প্রতি কেজি চাল বিক্রি হচ্ছে ৪৮ টাকায়। চালের এই দরও দেশের মধ্যে নতুন রেকর্ড। চাল-গমের দামবিষয়ক দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে খাদ্য মন্ত্রণালয়। তাতে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে সস্তায় চাল বিক্রি করছে ভিয়েতনাম। সেখানে চালের দাম পড়ে প্রতি কেজি ৩৩ টাকা ৬২ পয়সা। প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রতি কেজি চালের দাম ৩৪ টাকা ৪৩ পয়সা, থাইল্যান্ডে ৩৭ টাকা ৮১ পয়সা ও পাকিস্তানে ৩৮ টাকা ৫৪ পয়সা। এর বাইরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ চাল উৎপাদনকারী দেশ চীন ও ইন্দোনেশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র চাল উৎপাদন করলেও তারা তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে না। উল্টো তারা কিছু চাল আমদানি করে থাকে। এই হিসেবে সবচেয়ে বেশি দামে বাংলাদেশেই চাল বিক্রি হচ্ছে।

চাল নিয়ে রাজনৈতিক চাল

গত ৪০ বছরে ধানের উৎপাদন ১ কোটি টন থেকে বেড়ে ৩ কোটি ৪০ লাখ টন ছাড়িয়েছে। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার দেয়, তাতে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা ও ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যে সরকার দুই দফা সারের দাম কমায়। এতে টানা তিন বছর ধান, আলু, সবজি ও পাটের উৎপাদন বাড়ে। সরকার ঘোষণা করে, দেশ খাদ্য বা চাল উৎপাদনে স্বাবলম্বী। কিন্তু তার পরও এবারের ঈদে প্রায় এক কোটি গরিব মানুষকে চালের বদলে গম দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন জেলা থেকে অভিযোগ এসেছে, সেই গমে পোকা পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি গুদামে যেখানে ন্যূনতম মজুত ৬ লাখ টন থাকার কথা, সেখানে আছে ১ লাখ ৭৪ হাজার টন। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশে সাত লাখ টন চালের ঘাটতি ছিল, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে তা দাঁড়ায় নয় লাখ টন। উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় ২০১২ সালে চালের দাম প্রতি কেজি ৩০ টাকার নিচে নামে। তখন খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হলো, দেশে ২০ থেকে ৩০ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত রয়েছে। চালের উৎপাদন ও ভোগের বস্তুনিষ্ঠ হিসাব বের করতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে একটি গবেষণা করে। ওই গবেষণায় বলা হয়, দেশে রপ্তানি করার মতো উদ্বৃত্ত চাল নেই। কিন্তু খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানায়, দেশে ২৩ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত রয়েছে। কৃষককে ন্যায্য মূল্য দিতে চাল রপ্তানি করতে হবে। দেশে রপ্তানি করার মতো চাল নেই -এমন হিসাব থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের জুনে খাদ্য মন্ত্রণালয় আবারও চাল রপ্তানির তোড়জোড় শুরু করে। ওই বছরের ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কায় ৫০ হাজার টন চাল রপ্তানি করা হয়। সেই রপ্তানির সময়ও প্রতি মাসে গড়ে এক থেকে দেড় লাখ টন করে চাল আমদানি হচ্ছিল। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রায় ৩০ লাখ টন চাল আমদানি হয়।

২০১৬ সালের মে মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ১১টি জেলার বোরো ধানের আবাদ নিয়ে একটি জরিপ করে। তাতে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে, অর্থাৎ এক বছরে বোরো ধানের উৎপাদন সাত লাখ টন কমে গেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, হাওরে সর্বসাকুল্যে আট লাখ টন ধান নষ্ট হয়েছে, যদিও ১৬ জুন খাদ্যমন্ত্রী বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ২০ লাখ টন ধানের ক্ষতি হয়েছে বলে জানান। কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, হাওরে ফসলের ক্ষতি হলেও বোরোতে মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইফপ্রি) 'প্রধান খাদ্য উৎপাদনে নীরব বিপ্লব' শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, "বাংলাদেশে ৬৭ শতাংশ ধানের বাজার ও দাম নিয়ন্ত্রণ করেন বড় পাইকারি ব্যবসায়ী ও চালকলের মালিকেরা। মাত্র ৩০ শতাংশ চাল কৃষক বাজারমূল্যে বিক্রি করতে পারেন। ফলে ধানের দাম বাড়লে মূলত লাভ হয় ধনী ব্যবসায়ী ও চালকলের মালিকদের"।

কেন বাড়ছে চালের দর

বিশেষজ্ঞদের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মূলত চারটি কারণে মোটা চালের দাম এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। প্রথমত, সরকারি গুদামে চালের মজুত গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত শুক্রবার পর্যন্ত সরকারের চালের মজুত ছিল ২ লাখ ৩১ হাজার টন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি গুদামে কমপক্ষে ৬ লাখ টন চালের মজুত থাকা উচিত। এর চেয়ে কম মজুত থাকলেই সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা চালের দাম বাড়ান। এবারও তা-ই হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদের হাতে কী পরিমাণে চাল আছে সেই তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে নেই। কেউ চালের বেশি মজুত করল কি না, সেই তথ্য সরকার জানে না। ২০১২ সালে খাদ্য মজুত নিয়ন্ত্রণ আইন করা হলেও খাদ্য মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। তৃতীয়ত, দেশে চালের উৎপাদন ও ভোগের কোনো সমন্বিত তথ্য এখন পর্যন্ত সরকারের কাছে নেই। ২০১৩ সালে বিআইডিএসকে দিয়ে বাংলাদেশে চাল উদ্বৃত্ত আছে কি না সে সম্পর্কে একটি গবেষণা করানো হয়েছিল। ওই গবেষণায় দেশে কোনো উদ্বৃত্ত চাল নেই - এমন কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও দেশ খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত - এই তথ্য তুলে ধরে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে শ্রীলঙ্কায় ৫০ হাজার টন চাল রপ্তানি করা হয়। চতুর্থত, চার বছর ধরে চালের উৎপাদন খরচ ধারাবাহিকভাবে বাড়লেও কৃষক ভালো দাম পাননি। ফলে প্রতিবছরই চালের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে। ভালো দাম পাওয়া যায় এমন ফসলের দিকে কৃষক বেশি ঝুঁকে গেছেন। বর্তমানে এশিয়ার চাল উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি। এমনকি ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের বোরো ধানের উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ।

৯৫৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে চাল সিন্ডিকেট

জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বরাবরই দেশে চালের পর্যাপ্ত মজুদ আছে প্রচার করলেও চালের আমদানি শুল্ক কমাতে এনবিআরকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন ঠিক দুই মাস আগে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা কার্যকর হয়নি। অবশেষে আমদানি শুল্ক ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও ততদিনে জনগণের পকেট থেকে ৯৫৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। অভিযোগ রয়েছে, সিন্ডিকেটের সাথে যোগসাজশের কারণেই চালের আমদানি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তটি অনেক বিলম্বে এসেছে। আর সিদ্ধান্তটি যখন এসেছে তত দিনে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় শুল্ক কমিয়েও এ থেকে

কোনো সুফল পাওয়া যাবে না বলে আশঙ্কা সংশিষ্টদের। অনুসন্ধানে জানা যায়, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রতি টন চালে গড়ে ৫০০ টাকা হারে দাম বাড়ালেও দৈনিক লুট হয়েছে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। এভাবে গত দুই মাসে চাল সিন্ডিকেট ৯৫৮ কোটি টাকা লুটে নিয়েছে বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ৮ জুন, ২৮ মে ও ২৫ জুন ২০১৭; নয়াদিগন্ত, ২২ জুন ২০১৭*

এক বছরে কমপক্ষে ৭৩ হাজার কোটি টাকা পাচার

বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৯১১ কোটি ডলার পাচার হয়েছে ২০১৪ সালে। টাকার অঙ্কে যা প্রায় ৭২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা। এর অধিকাংশই হচ্ছে আমদানি-রফতানি চালানে জালিয়াতির মাধ্যমে। অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন করার মাধ্যমেই এই অর্থের বড় অংশ পাচার করা হয়েছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) গতকাল মঙ্গলবার অর্থ পাচারের এ তথ্য প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি আট বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থ পাচারের তথ্য প্রকাশ করে আসছে। এবারের প্রতিবেদনে রয়েছে ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল সময় পর্যন্ত তথ্য। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৪ সালে যে পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে পাচার হয়ে গেছে, তা চলতি অর্থবছরের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) খাতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার সমান। তা ছাড়া এই অর্থ চলতি অর্থবছরের পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, কৃষি ও পানিসম্পদ খাতের মোট উন্নয়ন বাজেটের সমান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার বা ৬ লাখ ৬ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা। এই অর্থ দিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রায় দুই অর্থবছরের বাজেট তৈরি করতে পারতেন।

আট বছর ধরেই জিএফআই অর্থ পাচারের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও এবারের রিপোর্টটি আগেরগুলোর তুলনায় ভিন্নভাবে তৈরি করা হয়েছে। এবার তারা মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কত শতাংশ পর্যন্ত অর্থ পাচার হয়েছে, সেই তথ্য প্রকাশ করেছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, তাদের দেওয়া অর্থ পাচারের সব হিসাবই রক্ষণশীল, অর্থ পাচারের প্রকৃত পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। গবেষণা পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণে জিএফআই এবারের প্রতিবেদনে গত ১০ বছরের বছরওয়ারি হিসাব আলাদা প্রকাশ করেনি। ফলে আগের বছরের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা যাচ্ছে না।

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ আরও বেড়েছে

সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকা রাখার পরিমাণ আরও বেড়েছে। এক বছরের ব্যবধানে এক হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ জমা হয়েছে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে। অথচ সারা দুনিয়া থেকে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে অর্থ জমার পরিমাণ কমেছে। ২০১৬ সালে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ১০ লাখ সুইস ফ্রাঁ, বাংলাদেশি মুদ্রায় বিনিময় করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকায়। ২০১৫ সালে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে জমার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৫ কোটি সুইস ফ্রাঁ, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে আগের বছরের চেয়ে এ জমার পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বা ২০ শতাংশ বেড়েছে। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) গতকাল বৃহস্পতিবার 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৬' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এসএনবির বার্ষিক এ প্রতিবেদন থেকে বাংলাদেশের অর্থ জমার এ তথ্য পাওয়া গেছে। এসএনবির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে সুইজারল্যান্ডে মোট ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ২৬১। এ ২৬১ টি ব্যাংকেই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব থেকে অর্থ জমা রাখা হয়। এসএনবির প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এক বছরের ব্যবধানে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশের অর্থ জমার পরিমাণ ২০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল - এই সময়ের মধ্যে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশের জমা রাখা অর্থের পরিমাণও তিন গুণ বেড়ে গেছে।

বিদেশে টাকা পাচার তেমন কিছু নয়: অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, "বিদেশে টাকা পাচারের বিষয়টি বাস্তবে মোটেই তেমন কিছু নয়"। গত ১১ জুলাই জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেয়া বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, "বিদেশে অর্থ যে পাচার হয় না, সে কথা আমি বলবো না। হ্যাঁ, সত্যিই পাচার হয়, তা অতি যৎসামান্য। এটা নজরে নেয়ার মতো নয়। কিন্তু সংবাদপত্রে যেভাবে অর্থপাচারের কথা বলা হচ্ছে তা- অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জিত। সুইজারল্যান্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে অনেক অর্থ লেনদেন হয়েছে। তবে এটি অর্থপাচার নয়। সুইস ব্যাংকে টাকা পাচার হয়নি। সংবাদপত্রে যেটা বেরিয়েছে সেটি লেনদেনের হিসাব"।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ০৩ মে ২০১৭; বণিকবার্তা, মে ০৩, ২০১৭; ৩০ জুন ২০১৭, প্রথম আলো; যুগান্তর, ১১ জুলাই ২১৭*

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো খেয়ে ফেলছে মূলধনও

সরকারি পাঁচ ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তির দুর্বলতা ক্রমেই প্রকট হয়ে পড়েছে। এসব ব্যাংক ঋণের মান অনুযায়ী নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে গিয়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পুরো হোঁচট খেয়েছে। এর ফলে ব্যাংকগুলো নিজের মূলধন তো হারিয়েছেই, উপরন্তু সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকার ঘাটতিতে পড়েছে। ব্যবসার পরিবর্তে এসব ব্যাংক এখন মূলধন জোগান নিয়েই চিন্তিত। ইতিমধ্যে মূলধন ঘাটতি মেটাতে সরকারের কাছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা চেয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। কারণ ঘাটতিতে থাকায় এসব ব্যাংক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যাংক ৫ টি হল- সোনালী, রূপালী, বেসিক, কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।

খেলাপি ঋণ লাগামহীন

খেলাপি ঋণের লাগাম কোনোভাবেই টানতে পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশেষ সুবিধা দিয়ে ১৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ দীর্ঘ মেয়াদে পুনর্গঠন করেছে। পর্যাপ্ত অর্থ জমা ছাড়াই ঋণ পুনঃ তফসিল করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরপরও গত মার্চ শেষে দেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট ঋণের ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ। গত বছরের মার্চে খেলাপি ঋণ ছিল ৫৯ হাজার ৪১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এক বছরে খেলাপি ঋণ বাড়ল ১৪ হাজার কোটি টাকা। এর বাইরে আরও ৪৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করা হয়েছে। এ তথ্য খেলাপির হিসাবে নিলে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা।

অথচ করের টাকা যাচ্ছে সরকারি ব্যাংকে

মানুষের করের টাকা রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে দিয়ে দিচ্ছে সরকার। সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা বাড়িয়ে বাড়তি রাজস্ব আদায় করে সরকার। আর এর একটি অংশ সরকারই দিয়ে দিচ্ছে সরকারি ব্যাংকগুলোকে। একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারি ও ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের কারণে বড় ধরনের মূলধন ঘাটতিতে আছে সরকারি ব্যাংকগুলো। এসব ব্যাংক টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে এখন বাজেট বরাদ্দ দিয়ে। প্রতিবছরের বাজেটেই ব্যাংকগুলোকে টাকা দেওয়ার জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এ নিয়ে একটি গবেষণা করেছে। সিপিডি বলেছে, ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত (২০১৬-১৭ অর্থবছর বাদে) আট বছরের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব আয় থেকে সরকার গড়ে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ অর্থ দিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মূলধন জোগানে। এই ৮ বছরের মধ্যে ৭ বছরই পুনর্মূলধনের নামে ব্যাংকগুলোকে দেওয়া হয়েছে ১১ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাজস্ব আয়ের বড় একটা অংশ চলে যাচ্ছে ব্যাংকগুলোর জন্য। চলতি অর্থবছরের জন্য রাখা হয়েছিল ২ হাজার কোটি টাকা, যা থেকে ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা এরই মধ্যে বেসিক, সোনালী, রূপালী- এসব ব্যাংককে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় টাকা দেওয়ার

সময় প্রতিবারই বলে দিচ্ছে যে খেলাপি ঋণ আদায়ে তাদের মনোযোগী হতে হবে। বাস্তবে খেলাপি ঋণ আরও বাড়ছে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে জনগণের করের টাকা চলে যাচ্ছে এসব ঋণখেলাপিদের পকেটে।

তথ্যসূত্রঃ *যুগান্তর, ৪ মে ২০১৭; ১৭ মে ২০১৭, প্রথম আলো; ৩০ মে ২০১৭, প্রথম আলো*

দুর্নীতি, দখলদারি ও লুটপাট

গুদাম রক্ষকের পেটে ১৮০০ টন খাদ্যশস্য

সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে হাওয়া হয়ে গেছে প্রায় এক হাজার ৮০০ টন খাদ্যশস্য। গুদামের রক্ষক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-এলএসডি) একেএম মহিউদ্দিন নিজেই এ বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করেছেন বলে নিশ্চিত হয়েছে খাদ্য অধিদপ্তর। আত্মসাৎ করা এ খাদ্যশস্যের সরকারি মূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা। তবে এর বাজারমূল্য ১০ কোটি টাকারও বেশি। ঘটনাটি ঘটেছে কুমিলার লাকসামের দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে। সম্প্রতি খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামের এ ভয়াবহ লুটের তথ্য উঠে আসে।

দল করেন, তাই দুস্থের সুবিধা পাচ্ছেন স্বচ্ছলরা

গাইবান্ধার কিশোরগাড়ি ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ডের সুবিধাভোগী ৩৩০ জন অতিদরিদ্র নারীর তালিকায় অনেক দরিদ্র নারীরই নাম নেই। সেখানে ঠাঁই করে নিয়েছেন সচ্ছল শতাধিক নারী। কার্ডপ্রতি ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে তাঁরা এসব ভিজিডি কার্ড পেয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বচ্ছল আওয়ামীলীগ নেতার স্ত্রীর নামেও ভিজিডি কার্ড রয়েছে। এমনই একজন আয়শা খাতুন বলেন, "আমার স্বামী আওয়ামী লীগ করে। তাই কার্ড পেয়েছি"। তার স্বামী আবদুস ছালাম পেশায় একজন পশুচিকিৎসক ও ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। নীতিমালা অনুযায়ী, দুস্থ, অসহায়, অতিদরিদ্র এবং ২৪ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে বয়সের নারীদের ভিজিডি কার্ড পাওয়ার কথা। এ ছাড়া যেসব দুস্থ নারী সরকারের অন্য কোনো সুবিধা পান না, তাঁরা ভিজিডি কার্ড পাবেন। এই কার্ডধারী প্রত্যেক সুবিধাভোগী ব্যক্তি মাসে ৩০ কেজি করে ২৪ মাস চাল পাবেন। ভিজিডি কার্ড-বঞ্চিত বেড়াডাঙ্গা গ্রামের জাহানারা বেগম (৪০) বলেন, "আমার স্বামী দিনমজুর। দেড় শতক জায়গায় একটি ছাপরাঘর ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু আমি ভিজিডি কার্ড পাইনি। একটি কার্ডের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে গেলে তিনি ৪ হাজার টাকা চান। টাকা দিতে না পারায় আমাকে কার্ড দেননি"।

সাংসদ হারুনের পাঁচ বছরেই এত সম্পদ

মাত্র পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগের সাংসদ বজলুল হক (বি এইচ হারুন) পরিবার বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে। কীভাবে হয়েছে, তার স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই বি এইচ হারুনের। ধর্ম মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বি এইচ হারুনের বিপুল সম্পদের সামান্য অংশ হচ্ছে রাজধানীর বনানীর বহুল আলোচিত দ্য রেইনট্রি হোটেল। কাগজে-কলমে হোটেলটির মালিকানা বি এইচ হারুনের স্ত্রী, তিন ছেলে ও মেয়ের নামে। আবাসিক এলাকায় গড়ে ওঠা এই বাণিজ্যিক হোটেল তৈরি করা হয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) অনুমোদন ছাড়া। গত ২৮ মার্চ হোটেলটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হন। বনানী থানা শুরুতে তাঁদের অভিযোগ আমলে নিতে চায়নি। যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় (আরজেএসসি) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি 'দ্য রেইনট্রি ঢাকা লিমিটেড' নামে যে কোম্পানি নিবন্ধিত হয়, তারই সংক্ষিপ্ত নাম রেইনট্রি হোটেল। বি এইচ হারুনের নামে থাকা জমিতে হোটেলটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১২ সালে আর বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু হয় চলতি বছরের শুরুর দিকে। বেআইনিভাবে পরিচালিত হওয়ায় গত ১৫ এপ্রিল হোটেলটি সিলগালা করে দিয়েছিলেন রাজউকের ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই অভিযানে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইনও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। হোটেলের মালিকেরা ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই আবার পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ পেয়ে যান।

২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামায় বি এইচ হারুন ৩৮ লাখ টাকার অর্থসম্পদ দেখান। কিন্তু ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে হলফনামায় বি এইচ হারুন দেখান, তাঁর নিজের ও স্ত্রীর শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ রয়েছে ১৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া ছোট ছেলে আদনান হারুনকে দুটি জাহাজ কিনতে ১৩ কোটি টাকা এবং বড় ছেলে নাহিয়ান হারুনকে প্রিমিয়ার ব্যাংকের পরিচালক হতে ২০ কোটি টাকা দেন। এ ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে ভাই ফয়জুর রব আজাদের নামে জমা রাখেন ১৫ কোটি টাকা।

সম্পদ বানায় এমপি মাহবুবের 'ভাগিনা' ও 'কামাইপুত'

কয়েক বছর আগেও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বদনামের মধ্যে ছিল টুকটাক চাঁদাবাজি। এখন কোটিপতি হিসেবে এলাকায় নামডাক। রাঙ্গাবালী উপজেলা সদরে বানিয়েছেন দ্বিতল মার্কেট। তা সরকারি খাসজমির ওপরে। জমিটি কী করে ব্যক্তিমালিকানায় চলে গেল তার হদিস করা দুষ্কর। আত্মীয়তার হদিস পাওয়া না গেলেও এই করিতকর্মা হুমায়ুন কবীর তালুকদার পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া-রাঙ্গাবালী) আসনের সংসদ সদস্য সাবেক প্রতিমন্ত্রী মাহবুবুর রহমান তালুকদারের 'ভাগ্নে'। একইভাবে স্থানীয় লোকমুখে রাঙ্গাবালী সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মামুন খান ও চরমোন্তাজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হানিফ মিয়ার পরিচিতি এমপির 'কামাইপুত' হিসেবে। এই দুই চেয়ারম্যান ভূমিহীনদের কাছ থেকে শতাংশ প্রতি তিন-চার হাজার টাকা নিয়ে খাসজমি বণ্টন করেন। এ টাকা উচ্চ পর্যায়ে ভাগাভাগি হয়। হুমায়ুন কবীর তালুকদার রাঙ্গাবালী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি। নুরে আলম বিপ্লব কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সহকারী এবং উপজেলা যুবলীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক। তিনিই আবার এমপির মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত হালিমা খাতুন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। রাঙ্গাবালী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ এমপির আশীর্বাদ নিয়ে বেপরোয়া চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে লিপ্ত বলে অভিযোগ আছে। তার এরূপ 'ভাগিনা' ও 'কামাইপুত'রা বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ *সমকাল, ৩ মে ও ২৪ মে, ২০১৭; প্রথম আলো, ১৬ মে ও ১৯ মে ২০১৭*

মানুষের কর্মসংস্থান কমেছে

এক দশক ধরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপরে আছে। গত দুই অর্থবছরে তা ৭ শতাংশ পেরিয়েছে। এত প্রবৃদ্ধি হলেও তা কর্মসংস্থান বাড়াতে পারছে না, বরং আগের তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতি কমেছে। এক দশক আগে প্রতিবছর গড়ে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ কর্মসংস্থান বাড়ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে এখন তা কমে ৯ লাখ ৩৩ হাজারে নেমেছে। কাজ করেন কিন্তু মজুরি পান না, তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই নারী। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, পুরুষদের চেয়ে নারীরা কম আয় করেন। নারীদের গড় আয় ১২ হাজার ১০০ টাকা। ২০১৩ সালে আয় ছিল ১০ হাজার ৮১৭ টাকা। এখন একজন পুরুষ গড়ে ১৩ হাজার ১০০ টাকা আয় করেন, দুই বছর আগে ছিল ১১ হাজার ৭৩৩ টাকা।

বেকার ২৬ লাখ

নতুন শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশে বেকারের সংখ্যা এখন ২৬ লাখ। এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠী সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগও পান না। তবে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি, ৯ শতাংশ। এর মানে হলো স্নাতক কিংবা এর বেশি ডিগ্রিধারী প্রতি ১০০ জনে ৯ জন বেকার। ২০১৩ সালের হিসাবে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ ৯০ হাজার। আইএলওর ডিসেন্ট ওয়ার্ক ডিকেড এশিয়া প্যাসিফিক ও আরব স্টেটস প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ তরুণ নিষ্ক্রিয়। তাঁরা পড়াশোনা করছেন না, আবার কাজও করছেন না। কিংবা কাজ খুঁজে পেতে কোনো প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন না। এ ধরনের নিষ্ক্রিয় তরুণদের হার বিবেচনা করলে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ তৃতীয় খারাপ

অবস্থানে আছে। একদিকে এসব নিষ্ক্রিয় তরুণ, অন্যদিকে কাজের আশায় মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে দেশের তরুণেরা সমুদ্রপথে পাড়ি দিচ্ছেন।
তথ্যসূত্রঃ ২৯ *মে ২০১৭, প্রথম আলো*

ভাঙতে হচ্ছে সিঙ্গেল লেনের ১০ হাজার সেতু

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার ঝিনাইগাতী-নতুন বাজার বর্ডার রোড ভায়া বাকাকুড়া সড়কে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে একটি ২০ ফুট দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) আওতাধীন এ সড়কে সেতুটি নির্মাণ করে ত্রাণ মন্ত্রণালয়। কিন্তু নির্মাণের ১০ বছর না যেতেই ধসে গেছে সেতুটির ছাদ। এতে যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে সেতুটি। পাশাপাশি সেতুর সামনের সড়কটি ডাবল লেনে রূপান্তরের কাজ হাতে নিয়েছে এলজিইডি। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেতুটি এখন ভেঙে ফেলা হচ্ছে। শুধু শেরপুরের এ সেতুই নয়, সারা দেশের প্রায় ১০ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ সিঙ্গেল লেন সেতু ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এলজিইডি।
তথ্যসূত্রঃ *বণিক বার্তা, মে ০৩ ২০১৭*

শ্রম অধিকারে সবচেয়ে খারাপ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

শ্রম অধিকার বিবেচনায় বিশ্বে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি রয়েছে, এমন ১০টি দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক শ্রম অধিকার-বিষয়ক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের (আইটিইউসি) এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি 'আইটিইউসি গোবাল রাইটস ইনডেক্স ২০১৭' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংগঠনটি।

বৈশ্বিক শ্রম অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়নকর্মীদের ওপর সরকার ও নিয়োগকর্তার চাপিয়ে দেয়া অব্যাহত ভোগান্তির কারণে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৫। এ রেটিংপ্রাপ্ত দেশগুলোয় শ্রমিকের অধিকারের কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ ছাড়াও তালিকার অন্য দেশগুলো হলো - কলম্বিয়া, মিসর, গুয়াতেমালা, কাজাখস্তান, ফিলিপাইন, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রম অধিকার পরিস্থিতি বিবেচনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে নেপাল ও শ্রীলংকা। দেশ দুটির রেটিং পয়েন্ট ৩। এর অর্থ ওই দেশ দুটিতে নিয়মিত অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নেই। তবে বাংলাদেশের মতো ৫ রেটিং রয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারেরও।

ন্যূনতম মজুরি নেই ৫৮ শিল্প খাতে

ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা হয়, কিন্তু বাস্তবায়ন হয় না। এ পর্যন্ত ৪২টি পেশায় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হলেও কোনো খাতেই শতভাগ বাস্তবায়ন হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত মজুরিও অত্যন্ত কম। এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৮ শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণাই করা হয়নি। প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে মজুরি পর্যালোচনার নিয়ম থাকলেও একবারও পর্যালোচনা করা হয়নি ঘোষিত বেশিরভাগ শিল্পে। অন্যদিকে, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন না হওয়া সহ শিল্পকারখানায় শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে গত এক বছরে ৮৭২টি মামলা করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)। ন্যূনতম মজুরি বোর্ড সূত্রে জানা যায়, স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ৪২টি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ গত মাসে ওষুধ শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়। ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ঘোষিত মজুরিও অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কম। মজুরি বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, পেট্রোল পাম্প শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মাসিক মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র ৭৯২ টাকা। মূল মজুরি ধরা হয়েছে ৫৬০ টাকা; বাড়ি ভাড়া ১১২ টাকা ও যাতায়াত বাবদ ২০ টাকা। ১৯৮৭ সালে মজুরি ঘোষণার পর এখন পর্যন্ত তা পর্যালোচনা করা হয়নি। পাঁচ বছরের মধ্যে মজুরি পর্যালোচনার নিয়ম থাকলেও গত ৩০ বছরেও কোনো কোনো খাতের মজুরি পর্যালোচনা না হওয়া প্রসঙ্গে মজুরি বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ পেলেই কেবল তারা মজুরি বোর্ড গঠন কিংবা পর্যালোচনা করে থাকেন। পর্যালোচনার জন্য সে রকম কোনো আদেশ তারা পাননি। ঘোষিত মজুরিও বাস্তবায়ন হয় না সব শিল্পে। ডিআইএফইর সর্বশেষ কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ শতাংশ কারখানায় সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো অনুসরণ করা হয় না। একই সংখ্যক কারখানার শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পান না। মূলত বড় কারখানার সাব-কন্ট্রাক্টের কাজ হয় এসব কারখানায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন নেই ৯৭ শতাংশ কারখানায়। পার্টিসিপেটরি কমিটি নেই ৬৫ শতাংশ কারখানায়। ৯ শতাংশ কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করেও ওভারটাইম পান না। এমনকি মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় না ৩৫ শতাংশ কারখানায়।

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে ৩ শ্রমিক নিহত

রমনা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবন থেকে পড়ে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে লিফট ওঠা-নামার ফাঁকা জায়গায় কাজ করার সময় ১০ তলা উচ্চতা থেকে তাঁরা নিচে পড়ে মারা যান। নিহত ব্যক্তিরা হলেন জাহাঙ্গীর হোসেন (২৫), মো. সায়েম (১৭) ও মো. জয়নুল (১৮)। রমনার আমিনাবাদ কলোনির পাশে বহুতলবিশিষ্ট একাধিক আবাসিক ভবন তৈরি করছে রূপায়ণ হাউজিং এস্টেট লিমিটেড। সেখানে নির্মাণাধীন ১৪ তলা একটি ভবনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, গতকাল দুপুরে লিফট ওঠা-নামার ফাঁকা জায়গায় রড বাঁধা এবং ঢালাইয়ের জন্য কাঠামো তৈরির কাজ করছিলেন তিন শ্রমিক। ১০ তলা উচ্চতায় ঝালাই করা রডের ওপর বাঁশের মাচায় দাঁড়িয়ে তাঁরা কাজ করছিলেন। বেলা সোয়া দুইটার দিকে রড ভেঙে গেলে তাঁরা নিচে পড়ে যান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যক্তিদের একাধিক সহকর্মী বলেন, ওই তিনজন হেলমেট, বুট ও সেফটি বেল্ট ছাড়াই কাজ করছিলেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন জাহাঙ্গীর হোসেন (২৫), মো. সায়েম (১৭) ও মো. জয়নুল (১৮)। রমনার আমিনাবাদ কলোনির পাশে বহুতলবিশিষ্ট একাধিক আবাসিক ভবন তৈরি করছে রূপায়ণ হাউজিং এস্টেট লিমিটেড।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক বলেন, মালিকপক্ষ আইন না মানার কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি নিহত প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবারকে ১০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

শ্যামপুরে ডাইং কারখানার দূষিত পরিবেশ

রাজধানীর শ্যামপুর-কদমতলী শিল্প এলাকায় বড় ডাইং কারখানা আছে ৫০টি। এসব কারখানায় শাড়ি, লুঙ্গি, থ্রিপিসসহ নানা রকমের কাপড় রং করা হয়। দেশের প্রায় ৬০ ভাগ কাপড়ে রং করা হয় এই ডাইং কারখানাগুলোয়। শ্যামপুর-কদমতলীর শিল্প মালিক সমিতির তথ্য বলছে, প্রতিটি ডাইং কারখানায় কমপক্ষে ২৫০ শ্রমিক কাজ করছেন। সেই হিসাবে এখানকার ডাইং কারখানাগুলোয় বর্তমানে সাড়ে ১২ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন। তাঁদের সবাই প্রায় একই রকম অমানবিক পরিবেশে কাজ করছেন। সবার স্বাস্থ্য সমস্যাও প্রায় একই। তাঁদের কারও নিয়োগপত্র নেই। সরেজমিন একাধিক ডাইং কারখানায় গিয়ে দেখা যায়, কারখানার ভেতরে প্রচণ্ড গরম। কারখানায় আলো-বাতাস ঢোকার কোনো ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকদের শরীর ঘামে ভেজা। কোনো শ্রমিকের হাতে দস্তানা (গ্লাভস) নেই। নাকে নেই কোনো মাস্ক। কারখানার মেঝেতে বিষাক্ত পানি। শ্রমিকেরা খোলা হাতে রং করার পাশাপাশি রাসায়নিক মেশাচ্ছেন। যত্রতত্র রাখা রাসায়নিকের ড্রাম। শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, শ্রমিকদের বড় অংশ প্রায় সময় গায়ে জ্বর নিয়ে কাজ করেন। ভোগেন পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া ও আমাশয়ে। প্রায় প্রত্যেক শ্রমিক বছরে এক থেকে দুবার জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছেন। শ্রম আইন বলছে, কারখানায় নির্মল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এমন তাপমাত্রা রাখতে হবে, যাতে শ্রমিকেরা আরামে কাজ করতে পারেন, তাঁদের যেন স্বাস্থ্যহানি না হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম থাকতে হবে। তিনশ শ্রমিক কাজ করলে কারখানায় একটি রোগীর

কক্ষ থাকতে হবে। তার দায়িত্বে থাকবেন একজন চিকিৎসক ও নার্স। শ্যামপুর-কদমতলী শিল্প এলাকার অন্তত ১০টি কারখানার ২০০ জন শ্রমিক জানান, তাঁদের কারও কোনো নিয়োগপত্র নেই। নেই কোনো পরিচয়পত্রও। মালিকদের যখন ইচ্ছা তখন শ্রমিককে কাজ থেকে বের করে দেন। কাজ করতে হচ্ছে ১২ ঘণ্টা করে। বিষয়টি জানানোর পর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) মো. মঞ্জুর কাদের খান বলেন, "আমার জানা ছিল না কদমতলী-শ্যামপুরের ডাইং কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে এমন আচরণ করছেন মালিকেরা।"

অপুষ্টিতে চা শ্রমিকদের মধ্যে বাড়ছে কুষ্ঠরোগ

সিলেটের চা বাগান ও হাওড়াঞ্চলে বাড়ছে কুষ্ঠরোগ। তবে এ অঞ্চলের চা শ্রমিকদের মধ্যে রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। সরকারি হিসাবেই গত এক বছরে সিলেট বিভাগে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬৭ জন। এর মধ্যে চা বাগান অধ্যুষিত মৌলভীবাজারেই আক্রান্ত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি, ২৯৪ জন। এছাড়া হবিগঞ্জে ৩৮, সুনামগঞ্জে ১৯ ও সিলেটে ১২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। আর চলতি বছর নতুন করে আরো অর্ধশতাধিক কুষ্ঠরোগী শনাক্ত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। তবে বেসরকারি হিসাবে কুষ্ঠরোগে আক্রান্তের সংখ্যা আরো বেশি, যাদের অধিকাংশই চিকিৎসার আওতায় আনা যায়নি। জানা যায়, সিলেট জেলার মধ্যে রোগটিতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায়। আর সিলেট জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে এ উপজেলায়ই।

সিলেট কুষ্ঠ হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডা. রুবিনা ফারজানা বলেন, "মূলত অপুষ্টি ও সচেতনতার অভাবে সিলেটে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। চা বাগান ও হাওড়াঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই অপুষ্টির শিকার। ফলে এসব অঞ্চলেই রোগটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি"। এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা বেশির ভাগ রোগীই চা শ্রমিক বলে জানান তিনি।

ভাটায় শ্রমিকদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই। তাঁদের দিন-রাত কাজ করতে হয়। শ্রমিকেরা মালিকের কাছ থেকে সরাসরি দাদন নেন না। দাদন দেন সরদার। সরদার হলেন শ্রমিকদের এলাকার একজন, যিনি ইটভাটার মালিকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে শ্রমিক কেনেন।

দাদনের ফাঁদে ইটভাটার লক্ষাধিক শ্রমিক

রাজধানীর আশপাশের প্রায় ৮০০ ইটভাটায় এক লাখের বেশি শ্রমিক দাদন নিয়ে কাজ করছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, শ্রমের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাঁদের। রাজধানীর কেরানীগঞ্জসহ আশপাশের ইটভাটাগুলোতে গিয়ে পাওয়া গেছে এই চিত্র। দাদনের জালে জড়িয়ে শ্রমিকেরা হাঁসফাঁস করলেও বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির মহাসচিব আবু বকর দাবি করেন, "শ্রমিকদের অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়। এই টাকার নামই দাদন। দাদনের টাকা আর শ্রমিককে ফেরত দিতে হয় না। দাদন নিয়ে শ্রমিকেরা ইটভাটায় কাজ করে ভালো টাকা উপার্জন করছেন"। রাজধানীর আশপাশে ৮০০ ইটখোলা রয়েছে, প্রতিটি খোলায় কমপক্ষে ২০০ শ্রমিক কাজ করছেন। সেই হিসাবেই রাজধানীর আশপাশে ১ লাখ ৬০ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন। কেরানীগঞ্জের জাজিরার চরের ইটখোলাতে গিয়ে দেখা যায়, বুড়িগঙ্গার তীরের ইটভাটাগুলোতে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের অধিকাংশ এসেছেন কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, ফরিদপুর ও বরিশাল থেকে। প্রত্যেক শ্রমিক ৬ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দাদন নিয়েছেন। ইট তৈরি থেকে ইট পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত এই শ্রমিকেরা গড়ে ৪ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পেয়ে থাকেন। শ্রমিকেরা বুড়িগঙ্গার তীরে ইটখোলায় ছোট্ট ছোট্ট ঘর তৈরি করে পরিবার নিয়ে থাকছেন। সেখানে শত শত শিশু মা-বাবার সঙ্গে থাকছে। ৮ বছর থেকে ১৪ বছরের কয়েকশ শিশু মা-বাবার সঙ্গে ইট টানার কাজ করছে। ইটভাটার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভাটায় শ্রমিকদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই। তাঁদের দিন-রাত কাজ করতে হয়। শ্রমিকেরা মালিকের কাছ থেকে সরাসরি দাদন নেন না। দাদন দেন সরদার। সরদার হলেন শ্রমিকদের এলাকার একজন, যিনি ইটভাটার মালিকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে শ্রমিক কেনেন। প্রতিটি ইটভাটার মালিক প্রতিবছর শ্রমিক কেনার জন্য সরদারদের ১০ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত দাদন দেন। সরদারেরা যাঁর যাঁর এলাকা থেকে শ্রমিক নিয়ে আসেন। জাজিরার চরে বাদশা ইটভাটার সরদার আবুল কালাম আজাদ বলেন, তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে ৬০ জন শ্রমিক নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক শ্রমিককে তিনি ১২ হাজার টাকা করে দাদন দিয়েছেন। আর এসব শ্রমিক গড়ে মাসে ৪ থেকে ৬ হাজার টাকা আয় করেন। তবে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইলে দাদন হিসেবে নেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে যেতে হবে। শ্রমিকরা বলেন, ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় আজকাল কোনো শ্রমিক পাওয়া যায় না। অথচ দাদনের ফাঁদে ফেলে সর্দার আর মালিকেরা তাঁদের ঠকাচ্ছেন। পাঁচ শ টাকার নিচে গ্রামে ধান কাটার একজন শ্রমিক পাওয়া যায় না। অথচ এখন মাত্র দেড় শ টাকায় ইটভাটায় কাজ করতে হচ্ছে।

চিংড়ি শ্রমিকের মজুরি কম, কাজ বেশি

দেশের রফতানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে হিমায়িত চিংড়ি। বিদেশের বাজারে ভালো চাহিদা থাকায় এ চিংড়িকে ঘিরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে উঠেছে অনেক হ্যাচারি ও ঘের, যেখানে কর্মরত প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা এসব চিংড়ি শ্রমিককে অল্প মজুরির বিনিময়ে অনেক বেশি খাটতে হয়। অনেক সময় অগ্রিম টাকার ফাঁদে ফেলে জোরপূর্বক শ্রম আদায় করা হয় তাদের কাছ থেকে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক এক গবেষণায় বাংলাদেশের চিংড়ি শ্রমিকদের এমন দুঃখ-দুর্দশার চিত্র উঠে এসেছে। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের অর্থায়নে পরিচালিত 'রিসার্চ অন ইন্ডিকেটর অব ফোর্সড লেবার ইন দ্য সাপ্লাই চেইন অব শ্রিম্প ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, চিংড়ি সংগ্রহ, ঘের ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানা প্রতিটি পর্যায়েই স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করতে হয় শ্রমিকদের। সারা দিন কাজ করেও গড়ে ১০০ টাকা আয় করতে পারেন না তারা। ঋণগ্রস্ততা, দালালের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ, সংসারের অভাব-অনটনসহ বিভিন্ন কারণে এভাবে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চিংড়ি শ্রমিকরা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অল্প মজুরির কারণে পরিবারের ভরণ-পোষণের বাইরে কিছু চিন্তা করার অক্ষমতা, কাজ চলে গেলে নতুন কাজ পাওয়ার অনিশ্চয়তার ফলে নীরবে শ্রম শোষণ মেনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক শ্রমিক। কাজ করতে গিয়ে অনেককে সহ্য করতে হচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনও। চিংড়ি খাতে ঘের, হ্যাচারি ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানা- এ তিন ধাপে কাজ হয়। ঘের ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় ছয় লাখ করে শ্রমিক রয়েছেন। আর চার লাখ নারী ও পুরুষ প্রাকৃতিক পোনা সংগ্রহের কাজ করেন। ঘেরে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ শ্রমিকই শিশু। ঘেরে একজন শ্রমিকের মাসিক আয় ২ হাজার ৫৮৮ টাকা। আর প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় এ আয় ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকা। গড়ে প্রতি মাসে ১ হাজার ২৬ টাকা আয় করেন পোনা সংগ্রহকারীরা। পোনা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিতদের ৮ শতাংশেরই বয়স ১৫ বছরের নিচে বলে তথ্য উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের এ প্রতিবেদনে বলা হয়, চিংড়িঘেরে ৮৪ শতাংশ শ্রমিকই কোনো ছুটি পান না। সপ্তাহে সাতদিনই কাজ করতে হয় তাদের। সেখানে কর্মরত ৪ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক ২১-২৪ ঘণ্টা, ৩ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক ১৬-২০ ঘণ্টা ও ১২ শতাংশ শ্রমিক ১১-১৫ ঘণ্টা কাজ করেন।

হ্যাচারি শ্রমিকরা কেউ বছরে একবার, কেউ ছয়বার পর্যন্ত ঋণ নেন। ঋণের পরিমাণ থাকে ২ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ শ্রমিক জানান, তাদের সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ শোধের সক্ষমতা নেই ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিকের। ঋণ শোধ করতেই রাত-দিন কাজ করতে হয় তাদের। পোনা সংগ্রহকারী কারো কারো এক বছরে ১০টি ঋণ নেয়া হয়েছে। একটি পরিশোধ করতে নেন আরেকটি ঋণ। এভাবে ফড়িয়া ও মহাজনদের কাছে ঋণের জালে আটকে থাকেন

শ্রমিকরা। ঋণের বোঝা সামলাতে মালিকদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজ করে দিতে হয় শ্রমিকদের। পোনা সংগ্রহকারীদের নোংরা কালো পানিতে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় দীর্ঘ সময়। এতে বেশি থাকে সাপে কাটা ও কাঁকড়ার ভয়। অনেক শ্রমিক সাপের কামড়ে মারা গেছেন। ঘের ও প্রসেসিং পান্টে সারা দিনে বিশ্রাম মাত্র ১০ মিনিট। যারা ফ্রিজিংয়ের কাজ করেন, তাদের ক্ষতি হয় বেশি। নারীদের মূত্রনালি ও গাইনি অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। চিংড়ি শ্রমিকরা প্রায়ই জ্বরে ভোগেন। চর্ম রোগও দেখা গেছে অনেকের মধ্যে। শ্রমিকদের ঘের মেরামত, পাড় নির্মাণ, বেড়া তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এমনকি পাহারাদারের কাজও করতে হয়। প্যাকেজিং হয়ে ফ্রিজে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে শ্রমিকরা কাজ করেন। তবে বেশির ভাগই মৌসুমি শ্রমিক। বেশি কাজ থাকে মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। মৌসুমি শ্রমিক নিয়োগ হয় ফড়িয়াদের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে আয়ের এক-তৃতীয়াংশই যায় তাদের পকেটে।

পুলিশ রিকশা আটক করায় নিজের গায়ে আগুন

ঢাকার আশুলিয়ায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযানের সময় ব্যাটারিচালিত একটি রিকশা জব্দ করায় এর চালক গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছেন। দগ্ধ শামিম সিকদারকে (৩৫) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পলাশবাড়ী এলাকার হাবীব ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন বলে জানান। তার মুখ, দুই হাত ও বুকসহ শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রায় ২৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের আশুলিয়া বাইপাইল এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা অবৈধ হওয়ায় এগুলো জব্দ করা হচ্ছিল। শামিমের রিকশাটি জব্দ করা হলে তিনি তা ফেরত পেতে অনুরোধ করেন। শামিমের বরাতে স্থানীয়রা বলেন, কনস্টেবল মনির রিকশার লাইটটি বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলেন। আর চালককে লাঠি দিয়ে মারধর করেন। তখন চালক শামীম রিকশা রেখে চলে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে গায়ে গামছা জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়ার হুমকি দিয়ে বলেন, রিকশা ফেরত না দিলে আগুন ধরিয়ে মরে যাবেন। তখন কনস্টেবল মনির তাকে দেয়াশলাই এগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গেই শামীম নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। কিন্তু স্থানীয়রা পানি ঢেলে নিভিয়ে ফেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, গায়ে আগুন দেওয়ার আগে শামিম বলছিলেন, এর আগেও তার রিকশা আটক করে দুই হাজার টাকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। এবারও টাকার জন্যই রিকশা আটক করা হয়েছে বলে শামিমের অভিযোগ।

তথ্যসূত্রঃ *বণিক বার্তা, ৪ মে, ২৩ জুন ও ২৬ মে, ২০১৭; প্রথম আলো, ৩ মে, ৭ জুন ও ৯ জুন ২০১৭; সমকাল, ০১ মে, ২০১৭; বিডিনিউজ২৪ডটকম, ৩০ জুন ২০১৭*

> ঘেরে একজন শ্রমিকের মাসিক আয় ২ হাজার ৫৮৮ টাকা। আর প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় এ আয় ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকা। গড়ে প্রতি মাসে ১ হাজার ২৬ টাকা আয় করেন পোনা সংগ্রহকারীরা।

গাজীপুরে বয়লার বিস্ফোরণে নিহত ১৩, নিখোঁজ ৩

গাজীপুরের কাশিমপুর এলাকার নয়াপাড়ার মাল্টিফ্যাবস পোশাক কারখানায় গত ৩ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে। এ ঘটনায় ১৩ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। তিনজন নিখোঁজ আছেন। আহত হয়েছেন ৫৩ জন শ্রমিক-পথচারী। কারখানা কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র বলেছে, কারখানার ধ্বংসস্তূপে আর কোনো লাশ না থাকায় ৪ জুলাই রাত ১০ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধারকাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ডাইংয়ে কাজ করছিলেন ১৩২ জন এবং বয়লারসহ অন্য সব শাখায় কাজ করছিলেন ৫১৩ জন শ্রমিক। ঘটনার দিন বয়লার অপারেটররা বয়লারটি মেইনটেন্যান্সের কাজ করছিলেন। পাশাপাশি ডাইং সেকশনেও শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন। কারখানার অধিকাংশ বিভাগই বন্ধ ছিল। না হলে ক্ষয়ক্ষতি আরও অনেক বেশি হতো।

নিহত ৩ শ্রমিকও মামলার আসামি!

গাজীপুরের কাশিমপুরে পোশাক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে হতাহত হওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গত ৪ জুলাই রাতে জয়দেবপুর থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলার বাদী জয়দেবপুর থানার অধীন চক্রবর্তী পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুর রশিদ। মামলায় তিনজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৮-১০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নাম উল্লেখ থাকা তিন আসামি হলেন কারখানার বয়লার অপারেটর আব্দুস সালাম, এরশাদ হোসেন ও মনছুরুল হক। তাঁরা বিস্ফোরণের ঘটনায় মারা গেছেন। মামলায় বলা হয়, বয়লারের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ও ঝুঁকিপূর্ণ জানার পরও আসামিরা পরস্পরের যোগসাজশে তা চালু করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে ৩০২, ৩০৭, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৩৮ ও ৪২৭ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

'গাজীপুরে কারখানায় বিস্ফোরণে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি'

পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই বয়লারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। গত ২৪ জুন বয়লারটি মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও সেটি চালানো হচ্ছিল। এমনকি বিস্ফোরণের আগে ডাইং সেকশনের শ্রমিকেরা দুর্ঘটনার আঁচ করেছিলেন। তবে কিছু হয়নি বলে তাঁদের আবার কাজে ফেরত পাঠানো হয়। এ দুর্ঘটনায় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে এ যাবৎ ছাড়পত্র ছাড়া বয়লার চালানোর দায়ে মাল্টিফ্যাবস কর্তৃপক্ষের জরিমানা করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়। তবে জরিমানার পরিমাণ মাত্র ২০ হাজার টাকা। জরিমানা নোটিশটি গত মঙ্গলবার মাল্টিফ্যাবসের নামে ইস্যু করেছে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়।

বয়লার বিস্ফোরণে সাড়ে পাঁচ বছরে নিহত ৬৯

দেশে কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে গত সাড়ে পাঁচ বছরে ৬৯ জন নিহত হয়েছেন। ২০১২ সাল থেকে চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত দুর্ঘটনায় হতাহত হওয়ার এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে। শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) গবেষণায় এ চিত্র উঠে এসেছে। বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বয়লার বিস্ফোরণে এতগুলো প্রাণ হারিয়ে গেলেও একটিতেও দায়ী ব্যক্তিরা সাজা পাননি। বিলসের গবেষণায় দেখা যায়, ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৩৩টি বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে মারা যান ৩৩ জন। এ সময়ে আহত হন ২৩৭ জন। আর এ বছর দুটি দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত ২৮ জন নিহত হয়েছেন। সাড়ে পাঁচ বছরে বয়লার বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ২৩৭ জন।

বয়লার বিস্ফোরণে দোষী ব্যক্তিদের সাজা হয় না

এর আগে মর্মান্তিক বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এ বছরের ১৯ এপ্রিল। দিনাজপুর সদর উপজেলার রানীগঞ্জে যমুনা অটোমেটিক রাইস মিলের বয়লার বিস্ফোরিত হয়ে ২৮ জন দগ্ধ হন। এ ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৮ শ্রমিকের। দিনাজপুরের বয়লার বিস্ফোরণের পর ২৪ এপ্রিল কোতোয়ালি থানায় যমুনা অটোমেটিক রাইস মিলের মালিক সুবল ঘোষসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিহত শ্রমিকদের একজনের স্ত্রী। ২ জুলাই দিনাজপুরের মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালত থেকে এই তিনজন জামিন পেয়েছেন। গত বছরের ১৬ জুলাই নওগাঁ সদর উপজেলার লস্করপুর এলাকার টুম্পা রাম রাইস মিলে বয়লার বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হন সাতজন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছিল। মামলার তদন্তের চালকল মালিক, ব্যবস্থাপকসহ সাতজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ফোরম্যানকে গ্রেপ্তার করা হলেও তিনি জামিনে মুক্তি পান। কারখানার বয়লারগুলো নিয়মিত দেখভালের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নামে একটি আলাদা কার্যালয়ই আছে, তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাবকে দায়ী করা হয়। তবে কার্যালয় সূত্রগুলো বলেছে, এই সাড়ে পাঁচ হাজার বয়লার পরিদর্শনের জন্য মাত্র পাঁচজন পরিদর্শক আছেন। এই অপ্রতুলতাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৮০০ বয়লার মেয়াদোত্তীর্ণ

বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বর্তমানে পাঁচ হাজার ৫০০ বয়লার ব্যবহার হচ্ছে। এসবের ৮শই মেয়াদ উত্তীর্ণ। প্রতিদিনই বাড়ছে এ সংখ্যা। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শুধু গত জুন মাসেই বিভিন্ন কারখানার ৪৯৮টি বয়লার মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে মাসের পর মাস ব্যবহার করা হচ্ছে এই বয়লারগুলো। যে কোনো মুহূর্তে ফের ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এ নিয়ে জীবন এবং সম্পদহানির ঝুঁকি রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত জুন মাসে ৪৯৮ টি কারখানার বয়লার মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। এরমধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি রয়েছে গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানায় ১৬১ টি। ঢাকা জেলায় ৯১ টি, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদীতে ৪৯ টি, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে যথাক্রমে ৭১ এবং ৭২ টি। বাকি মেয়াদোত্তীর্ণ বয়লারগুলো দেশের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহার হচ্ছে। গত মে মাসে এ সংখ্যা ছিল ৫৭০। এর মধ্যে ২০০ টি বয়লার পরিদর্শনের শেষে আরও এক বছরের জন্য মেয়াদ নবায়ন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ৩ জুলাই, ৪ জুলাই ও ৬ জুলাই ২০১৭; সমকাল, ৬ জুলাই, ২০১৭*

সাগরপথে ইউরোপে বেশি মানুষ পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে

ইউরোপে শরণার্থী সংকটের চার বছর পরও সাগরপথে মানব পাচারের ধারা অব্যাহত আছে। মানব পাচারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে লিবিয়ার একটি পাচারকারী চক্র এখন এশিয়ার দেশ থেকে সাগরপথে লোকজন পাঠাচ্ছে ইতালিসহ ইউরোপের নানান গন্তব্যে। এ বছরের প্রথম তিন মাসে সাগরপথে পাচার হওয়া লোকজনের শীর্ষে আছেন বাংলাদেশের নাগরিকেরা। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) পরিসংখ্যান দিয়ে গতকাল শনিবার যুক্তরাজ্যের ইনডিপেনডেন্ট এ খবর জানিয়েছে। পত্রিকাটি বলছে, এ বছরের প্রথম তিন মাসে লিবিয়া থেকে অন্তত ২ হাজার ৮৩১ জন বাংলাদেশি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে ইতালিতে। গত বছর সংখ্যাটি ছিল মাত্র একজন। লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস আর ঢাকায় আইওএমের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে অন্য চিত্র পাওয়া গেছে। তাঁদের মতে, বছর চারেক আগে শরণার্থী সংকটের শুরু এবং দুই বছর আগে সাগরপথে মানব পাচার শুরুর পর থেকেই প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকজন ইতালিসহ ইউরোপের নানা গন্তব্যে যাচ্ছেন। ইনডিপেনডেন্ট- এর খবরে বলা হয়েছে, ভূমধ্যসাগরে উদ্ধার হওয়া লোকজন ত্রাণকর্মীদের জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে দুবাই কিংবা তুরস্ক হয়ে লিবিয়া পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেকে দালালকে ১০ হাজারের বেশি ডলার দিয়েছেন। সাগরপথে ইতালি যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক রুটে পরিণত হয়েছে উত্তর আফ্রিকার দেশটি। এ বছর সাগরে ডুবে, দম বন্ধ কিংবা জাহাজে গাদাগাদির কারণে শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় প্রায় ১ হাজার ১০০ লোক বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ *০৭ মে ২০১৭, প্রথম আলো*

খাদ্য সংকটে বাঘাইছড়ির দুর্গম অঞ্চল

গত বছরের মে মাসে তীব্র খাদ্য সংকটে পড়েছিল পার্বত্য খাগড়াছড়ির দুর্গম এলাকা থানচি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একই সংকট দেখা দিয়েছে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম গ্রামগুলোয়। এ অবস্থায় জরুরি খাদ্য সহায়তা দেয়া না হলে খাদ্য সংকট আগামী কয়েক মাস স্থায়ী হতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়ন ছাড়াও বেশকিছু এলাকায় দুই মাস ধরে খাদ্যের মজুদ কমে এসেছে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে ধানের ফলন আশানুরূপ না হওয়ায় ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ হ্রাস পাওয়ায় শুধু সাজেক ইউনিয়নেরই ১৫-২০টি গ্রামে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, বাঘাইছড়ি উপজেলায় মোট ১৯ লাখ ৩১ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে ফসলি জমির পরিমাণ ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮৯৯ হেক্টর। তবে পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত জমির পরিমাণ ৭ হাজার ৬২০ হেক্টর। এর মধ্যে এক ফসলি জমি ৪ হাজার ১৭০, দুই ফসলি ২ হাজার ৮০৩ ও তিন ফসলি জমির পরিমাণ ৬৪৭ হেক্টর। বাঘাইছড়ির ইউনিয়নগুলোর মধ্যে রয়েছে - সাজেক, আমতলী, বঙ্গলতলী, রূপকারী, মারিশ্যা, খেদারমারা, সারোয়াতলী ও বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন। তবে দুর্গম হওয়ায় সাজেক, আমতলী ও বঙ্গলতলী ইউনিয়নে খাদ্য সংকট রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের শুরুতে বান্দরবানের থানচি উপজেলার রেমাক্রি, তিন্দু, ছোট মদক, বড় মদক ও সাংগু রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এপ্রিল-মের দিকে সংকট তীব্র রূপ ধারণ করে। মূলত জুমের ফলন কমে যাওয়ায় গত বছর থানচির এসব দুর্গম গ্রামে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল।

তথ্যসূত্রঃ *৫ মে ০৫, ২০১৭, বণিক বার্তা*

পাহাড়ে চার হাজার একর ভূমি নিয়ে কী হচ্ছে

বান্দরবানের লামায় রাবার ইন্ডাস্ট্রিজসহ তিন প্রতিষ্ঠানের নামে পাহাড়িদের চার হাজার একর জমি অবৈধভাবে দখল করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। পাহাড়ে এই চার হাজার একর ভূমি নিয়ে কী হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে শনিবার লামায় যেতে চেয়েছিল জাতীয় পর্যায়ের একটি নাগরিক প্রতিনিধি দল। কিন্তু তাদের সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি। শনিবার সকালে বান্দরবানের রেইছা এবং দুপুরে লামা উপজেলার ইয়াংছায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকজন তাদের বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন নাগরিক প্রতিনিধিরা। তারা এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা। নাগরিক প্রতিনিধি দলে ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান ও মানবাধিকারকর্মী রওশন মাসুদা। এ ছাড়া আইনজীবী এবং সাংবাদিকরাও ছিলেন এই প্রতিনিধি দলে।

> বয়লার বিস্ফোরণে এতগুলো প্রাণ হারিয়ে গেলেও একটিতেও দায়ী ব্যক্তিরা সাজা পাননি। বিলসের গবেষণায় দেখা যায়, ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৩৩টি বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বান্দরবান থেকে ফিরে এসে চট্টগ্রামে ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য সমকালকে বলেন, "রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান দেড় হাজার একর, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন দুই হাজার একর ও স্বঘোষিত সন্ত্রাসী লাদেন বাহিনী ৫০০ একর জুম্ম জনগোষ্ঠীর জায়গা অবৈধভাবে দখল করেছে। আমরা সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সরেজমিন দেখতে বান্দরবান গিয়েছিলাম। কিন্তু নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকজন আমাদের ঢুকতে দেয়নি। বাধা দিয়েছে। কেন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তারও কোনো ব্যাখ্যাও দেয়নি। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিষয়টি উদ্বেগজনক"।

তথ্যসূত্রঃ *০৭ মে, ২০১৭, সমকাল*

সুন্দরবনের পাশে ১৮৬ শিল্প ও প্রকল্প!

পরিবেশ অধিদপ্তরের খুলনা কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কিলোমিটার ইসিএ এলাকায় মোট ১৮৬টি শিল্প ও প্রকল্পকে পরিবেশের প্রাথমিক (অবস্থানগত) ও চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটির সমীক্ষা থেকে ওই হিসাবটি পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার মোট ৯টি উপজেলায় ১৪০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প ছাড়পত্র পেয়েছে। এ ছাড়া মংলা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকায় (ইপিজেড) ২১টি, মংলা বন্দর শিল্প অঞ্চলে ২০টি, মংলা বন্দরসংলগ্ন এলাকায় ৫টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। এর বাইরে আরও ১৬টি

প্রতিষ্ঠান ছাড়পত্র পেতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে আবেদন করেছে। গত মে মাসে সরেজমিনে মংলা ইপিজেড ও শিল্পাঞ্চলে বিশাল সব শিল্পকারখানার সারি পেরিয়ে রামপালের দিকে যেতে রাস্তার দুই পাশের জমিতে চোখে পড়ে, নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মালিকানা দাবি করা সাইনবোর্ড। মংলা থেকে দ্বিগরাজ ইউনিয়ন সদরের পাশ দিয়ে দেখা গেল, সদ্য নির্মিত বিশাল রাস্তা গ্রামের ভেতরে চলে গেছে। রাস্তার শেষ সীমানায় রয়েছে ইনডেক্স গ্রুপ নামের একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিজি) প্ল্যান্ট। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিবেদন বলছে, ইনডেক্স গ্রুপের প্ল্যান্টটি সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে পড়েছে। তবে সুন্দরবনের ২ কিলোমিটারের মধ্যে জয়মনি গ্রামে তাদের বেশ কয়েকটি শিল্প প্লট রয়েছে। সুন্দরবনের এক কিলোমিটার সীমানায় মোংলা উপজেলার জয়মনির ঘোল গ্রামে প্রায় ২০০ একর জমি কিনেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ। তিনি সেখানে সানমেরিন শিপইয়ার্ড নামে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা করার জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র নিয়েছিলেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, ওই জমিতে স্থানীয় দুজন ব্যক্তি ইজারা নিয়ে চিংড়ি চাষ করছেন। গত বছরের আগস্টে প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১৫০টি শিল্প প্রকল্প পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। দেড় বছরের মাথায় আরও ৩৬টি শিল্প প্রকল্প ছাড়পত্র পেয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ১২ জুলাই, ২০১৭*

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প: ব্যয় বেড়েছে ৭৫০০ কোটি টাকা

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যয় এখন সরকারি হিসাবে ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ লাখ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) দলিলে এই ব্যয়ের অঙ্ক উলেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় সম্পর্কে আগে যা প্রকাশ হয়েছে, এই ব্যয় তার চেয়ে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা বেশি। অর্থ, পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আলাদা আলাদা সূত্র বলেছে, রূপপুর প্রকল্পের ব্যয় আরও বাড়বে। সূত্রগুলো বলেছে, রূপপুর প্রকল্পের ব্যয় সম্পর্কে সরকার স্পষ্ট করে কিছু না বলায় বা বলতে না পারায় এ বিষয়ে শুরুতেই প্রশ্ন উঠেছিল। অনেকে ধারণা করেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে সই হওয়া সাধারণ চুক্তি (জেনারেল কন্ট্রাক্ট) অনুযায়ী প্রকল্পের যে ব্যয় নির্ধারিত হয়েছিল (১ হাজার ২৬৫ কোটি মার্কিন ডলার বা ১ লাখ ১ হাজার কোটি টাকা), সেটাই এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যয়। রূপপুর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শৌকত আকবর তখন গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, সাধারণ চুক্তিতে যে ব্যয় ধরা হয়েছে, সেটি প্রকল্পের 'ফার্ম অ্যান্ড ফিক্সড কস্ট'। এই ব্যয় প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদে আর বাড়বে না। তবে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তখন বলেছিলেন, রূপপুর প্রকল্পের অনেক 'হিডেন কস্ট' অর্থাৎ লুক্কায়িত ব্যয় আছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক বর্জ্য রাশিয়ার ফেরত নেওয়ার বিষয়ে চুক্তির খসড়া ৫ জুন মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। এ-সংক্রান্ত চুক্তিটি কবে সই হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

তথ্যসূত্রঃ *৩০ জুন ২০১৭, প্রথম আলো*

টেলিফোনে আড়িপাতা সংস্থা শক্তিশালী হচ্ছে

টেলিফোনে আড়িপাতার মত নজরদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের কারিগরি সক্ষমতা বাড়াতে একটি বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে বলে সংসদকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। গত ২৮ জুন বুধবার সংসদ অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য বজলুল হক হারুনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা ও গোপনীয়তা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য অধিকার আইনেও এর উল্লেখ রয়েছে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে বিতর্কিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইনে সরকারকে প্রয়োজনে আড়িপাতার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ফোনে আড়িপাতা এবং ইন্টারনেটে নজরদারির বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কাজটি করা হত প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে (ডিজিএফআই) একটি তদারক কেন্দ্র থেকে। এরপর ২০১৩ সালে ডিজিএফআই ভবনেই ৪৪ জন জনবল নিয়ে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) যাত্রা শুরু করে। গত মার্চে এনটিএমসির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ডিজিএফআইয়ের উপ-মহাপরিচালক পদে থাকা ব্রিগেডিয়ার জিয়াউল আহসানকে, যিনি এক সময় র‍্যাবেও কাজ করেছেন।

তথ্যসূত্রঃ *২৮ জুন ২০১৭,বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*

রাজধানীসহ সারাদেশে চিকনগুনিয়ার প্রকোপ

বর্তমানে রাজধানীর সবচেয়ে বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা চিকুনগুনিয়া নিয়ে। রাজধানীতে প্রতিদিন অনেকেই চিকনগুনিয়া ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। যারা চিকিৎসার জন্য রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ছুটছেন। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রাজধানীসহ সারা দেশে এ ভাইরাস জ্বরটির প্রকোপ বাড়ছে। লক্ষণ দেখে ও রক্তে সেরোলজিক্যাল টেস্ট করে রোগটি ডায়াগনসিস করা হয়। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজধানীর প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

'বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মশা মারা সম্ভব না': মেয়র আনিসুল হক

গত ১৪ জুলাই শুক্রবার সকালে গুলশানের ডিএনসিসি কার্যালয়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ তথা চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে ডিএনসিসির নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের কাছে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্ন ছিল, চিকুনগুনিয়া মহামারি কি না? উত্তরে রোগতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান বলেন, "চিকুনগুনিয়া যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, একটি নির্দিষ্ট এলাকার যে পরিমাণ মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছে, তাতে এটা অবশ্যই মহামারি"। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন কীটতত্ত্ববিদ তৌহিদ উদ্দীন আহমেদ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র আনিসুল হক বলেন, "মহামারি হোক আর যাই হোক, এর জন্য কোনোভাবেই সিটি করপোরেশন দায়ী না। চিকুনগুনিয়া ছড়িয়ে পড়ার জন্য যেভাবে সিটি করপোরেশনকে দায়ী করা হচ্ছে, সেটার কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মশা মারা সিটি করপোরেশনের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া ঢাকার এমন অনেকে এলাকা রয়েছে, যেখানে গিয়ে সিটি করপোরেশন মশার ওষুধ ছিটাতে পারে না। চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণে জনগণের সম্পৃক্ততাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ"। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ ও সমবেদনা জানান তিনি।

তথ্যসূত্রঃ *সময়নিউজ ডট টিভি, ১৫ মে ২০১৭; ইত্তেফাক, ৫ জুলাই ২০১৭; আমাদের সময়, ১৬ মে ২০১৭; ইত্তেফাক, ১১ জুলাই ২০১৭; প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০১৭*

[গ্রন্থনাঃ কল্লোল মোস্তফা, অনুপম সৈকত শান্ত, ফাহিমা কানিজ লাভা, তন্ময় কর্মকার ও সিরাজুস সালেকিন]

পুলিশের টিয়ারশেল আঘাত করলো সিদ্দিকুর রহমানের চোখে
কার্টুনিস্ট: মেহেদী হক